গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা | ২৭ জুন - ৩ জুলাই ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

ইরানের উপর বর্বর মার্কিন হামলাকে ধিক্কার এসইউসিআই(সি)-র

এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক প্রভাস ঘোষ ২২ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, সমস্ত আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে, এমনকি আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (আই এ ই এ)-র সতর্কতা উপেক্ষা করে এবং বিশ্বের শান্তিকামী জনগণের মতামত অগ্রাহ্য করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইরানের উপর যে বর্বর সামরিক আক্রমণ চালিয়েছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করি।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দানবেরা মধ্যপ্রাচ্যে তাদের এজেন্ট রাষ্ট্র ইজরায়েলকে মদত ও উস্কানি দিয়ে গাজায় নৃশংস গণহত্যা চালিয়ে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ প্যালেস্টিনীয়কে খুন করেছে। এখন তারা ইরানের উপর সম্পূর্ণ বিনা প্ররোচনায় ভয়ঙ্কর আক্রমণ নামিয়ে এনে ইরানকে তাদের হুমকির সামনে মাথা নত করাতে চায় যাতে এই অঞ্চলে তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয় এবং তাদের কর্তৃত্ব স্থাপনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কেউ মাথা তোলার সাহস না পায়। কিন্তু তাদের সর্বনাশা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ইরানের জনগণ সাহসের সঙ্গে

পাঁচের পাতায় দেখুন

প্রত্যাঘাতে শঙ্কিত হয়েই কি আমেরিকার ইরান আক্রমণ

ইরানের উপর মার্কিন হামলার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর ডাকে ২২ জুন দেশ জুড়ে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। কলকাতায় লেনিন মূর্তির সামনে থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল মার্কিন কনসুলেটের দিকে এগোলে পার্ক স্ট্রিট মোড়ে পুলিশ বাধা দেয়। সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সভার পর ট্রাম্প ও নেতানিয়াহুর কুশপুতুলে আগুন দেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

আমেরিকা কি তা হলে ভয় পেল ইরানকে? ইরানের পাল্টা আক্রমণ ঠেকানোর ক্ষমতা ইজরায়েল কি হারিয়ে ফেলছিল? শেষ হয়ে আসছিল তার অস্ত্রের ভাণ্ডার? না হলে হঠাৎ আমেরিকাকে আসরে নামতে হল কেন?

সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ও বিশ্ব-জনমতকে দু'পায়ে মাড়িয়ে শেষপর্যন্ত ইরানের উপর সরাসরি হামলা চালাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ২২ জুন ভোরে ইরানের ফোর্দো, নাতানজ ও ইস্পাহানের তিনটি পরমাণু কেন্দ্রে শক্তিশালী বাঙ্কার বাস্টার বোমা বর্ষণ করে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের শিরোমণি, গোটা পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছে চরম ধিক্কৃত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে মন্তব্য করেছেন— 'এইবার শান্তির সময় এসেছে'। পশ্চিম এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মুখ ইজরায়েলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সরাসরি ইরানে হামলা চালিয়ে রক্তস্নাত ওই এলাকায় নতুন করে বিপর্যয় সৃষ্টিই শুধু নয়, গোটা বিশ্বকেই এবার যুদ্ধের হুমকির সামনে ঠেলে দিয়ে শান্তির বাণী— চমৎকার বৈ কী!

সাতের পাতায় দেখুন

রাজ্যে প্রসূতি মৃত্যুর হার এত বেশি কেন

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, ২০২১-'২২ সময়কালের প্রসূতি মৃত্যুর হার। স্বাধীনতার ৭৮ বছর পরে দেশ যখন প্রযুক্তিতে অগ্রগতির শিখরে, ভারতীয় মহাকাশযান চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে যাচ্ছে, দেশকে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি বানানোর ঢাক পেটাচ্ছেন শাসকরা, সেই সময় দাঁড়িয়ে সন্তান প্রসবের মতো অতি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং শারীরবৃত্তীয় একটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে এত বেশি সংখ্যক মহিলার মৃত্যু ঘটছে কেন?

একটা সময় ছিল যখন হাসপাতালে প্রসবের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ২০০৫-এও প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের সংখ্যা ছিল ৪৩ শতাংশ, তখন এক লক্ষ জীবন্ত প্রসব পিছু সারা ভারতে ২৫০ জন মায়ের মৃত্যু হত। পশ্চিমবঙ্গে তখন এই মৃত্যুর হার ছিল ১৪০। ক্রমশ প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের হার বাড়তে থাকে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে যা প্রায় ৯৭ শতাংশ এবং ভারতবর্ষের গড় বর্তমানে ৯২ শতাংশ। ২০১৮ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মাতৃমৃত্যুর হার ভারতবর্ষের গড় মাতৃমৃত্যুর হারের তুলনায় কম ছিল। কিন্তু লক্ষণীয়, ২০১৮-২০ সাল পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের মাতৃমৃত্যুর হার যখন কমতে কমতে প্রতি ১ লক্ষে ৯৭-এ এসে দাঁড়িয়েছে, তখন পশ্চিমবঙ্গের মাতৃমৃত্যুর হার আবার বেড়ে ১০৯ হয়েছে। সেই থেকে ২০২৫ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মাতৃমৃত্যুর হার ভারতবর্ষের গড় মাতৃমৃত্যুর হারের তুলনায় বেশিই থেকে যাচ্ছে। সম্প্রতি স্যাম্পল রেজিস্ট্রেশন সার্ভের (এসআরএস) ২০২০-২২ রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে সারা দেশে মাতৃমৃত্যুর হার কমে দাঁড়িয়েছে ৮৮, সেখানে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মাতৃমৃত্যুর হার ১০৫।

মৃত্যুর কারণ

১) বর্তমানে যে সব কারণে মাতৃমৃত্যু ঘটে থাকে তার

দুয়ের পাতায় দেখুন

বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে মুরারই বিডিও-তে খাদান শ্রমিকদের বিক্ষোভ

বন্ধপাথর কারখানা খোলার দাবিতে ১৭ জুন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত রাজগাঁও স্টোন কোম্পানি লেবার ইউনিয়নের ডাকে বীরভূম জেলার মুরারই-১ বিডিও অফিসে পাঁচ শতাধিক পাথর খাদান শ্রমিক বিক্ষোভ দেখান। বজলের হাটের জমায়েত থেকে শুরু হয় মিছিল। নেতৃত্বে ছিলেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সভাপতি কমরেড এ এল গুপ্তা, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড

পাঁচের পাতায় দেখুন

শ্রম অধিকারের নিরিখে
ভারত সব থেকে পিছিয়ে

সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন শ্রম অধিকার সম্পর্কে যে আন্তর্জাতিক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে তাতে বিশ্বের ১৫১টি দেশের মধ্যে ভারত সব থেকে পিছিয়ে। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে বেশিরভাগ শ্রমজীবী মানুষের ইউনিয়ন করার অধিকার নেই। মোদি সরকার ২৯টি শ্রম আইন পাল্টে দিয়ে যে চারটি শ্রমকোড এনেছে তাতে হরণ করা হয়েছে ইউনিয়ন করার অধিকার। আমাদের দেশের একদল মানুষ শ্রমিক ইউনিয়নের কথা শুনলেই বলে ওঠেন, সরকার ঠিক করেছে ইউনিয়ন করার অধিকার হরণ করে। কিন্তু তাঁরা ভেবে দেখেন না, ইউনিয়ন গড়ে শ্রমিকরা যদি তাঁদের ন্যায্য দাবিগুলি তুলে ধরতে না পারেন এবং আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সেগুলি আদায় করতে না পারেন তবে তাঁরা মালিকদের একতরফা শোষণ-লুণ্ঠনের শিকার হতেই থাকবেন। মনে রাখা দরকার, মালিকদের এমন একতরফা অধিকার দিয়ে দিলে সমাজের বাকি অংশও তাদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাবে না।

কেন্দ্রের মোদি সরকার বিকশিত ভারতের মন্ত্র জপ করে চলেছে। তাঁর রাজত্বে কাদের বিকাশ ঘটছে? সম্প্রতি ‘গণদাবী’তে আমরা দেখিয়েছি ভারত যে অর্থনীতিতে চতুর্থ হওয়ার দাবি করছে, জনজীবনে তার কোনও সুফলই ফলবে না। সাধারণ মানুষের জীবনে তার কোনও ছোঁয়া নেই। এই সমৃদ্ধি ভারতের একচেটে পুঁজিপতি শ্রেণির। বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যার নিচের দিকের ৫০ শতাংশের গড় মাসিক আয় ৫৯৩০ টাকা, মাঝের ৪০ শতাংশের গড় আয় ১৩,৭৫০ টাকা। সব মিলিয়ে ৯০ শতাংশের আয় যা, তাতে সুস্থভাবে পরিবার প্রতিপালন করাই কঠিন। আর উপরের ১ শতাংশের গড় আয় মাসে সাড়ে ৪ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। সর্বোচ্চ ০.১ শতাংশের গড় আয় মাসে প্রায় ১৯ লক্ষ টাকার কাছাকাছি। এই তথ্য দেখিয়ে দেয়, মোদি সরকারের বহু বিজ্ঞাপিত বিকশিত ভারতে বাস্তবে কাদের বিকাশ ঘটেছে। এই যে ধনকুবেরদের বিপুল সমৃদ্ধি, এটাই বিজেপি সরকারের বিকশিত ভারতের মডেল।

এই ভারতে শ্রমিক, চাষির স্থান কোথায়? ভারতের শ্রমশক্তির কমবেশি ৯৫ শতাংশই অসংগঠিত। এই ক্ষেত্রের বেশিরভাগ শ্রমিক শ্রম আইনের আওতার বাইরে। এদের কোনও আইনি সুরক্ষা নেই। এদের একটা বিশাল অংশের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো, পিএফ-পেনশনের ব্যবস্থা ইত্যাদি কোনও সুবিধা নেই, মালিক যেমন খুশি কম বেতন দিতে পারে, যখন খুশি ছাঁটাই করতে পারে। বর্তমানে ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে সম কাজে সম বেতনের নীতি। কাজের সুযোগও ক্রমাগত কমছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই মালিকদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়ায়, উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন করার চেষ্টা মালিকরা করে চলেছে। সেই লক্ষ্যেই উন্নত প্রযুক্তি বসছে। তাতে ছাঁটাই হচ্ছে শ্রমিক। কাজের স্থায়ীপদগুলিকেও অস্থায়ী করে দেওয়া হচ্ছে। পদ বিলোপ ঘটছে। বেতন কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শ্রমিকরা এতদিন ধরে যে সামাজিক সুরক্ষার সুবিধাগুলি পেতেন, সেগুলিও ছাঁটাই বা বন্ধ হচ্ছে। বেতন হ্রাস এবং কাজের সময় বৃদ্ধি পুঁজিপতিদের মুনাফার বিপুল উৎস।

মোদি বিজ্ঞাপিত বিকশিত ভারত বা শ্রম অধিকারে পিছিয়ে ভারত— দুটো চিত্রই আজ বাস্তব। ৫ শতাংশ ধনীর বিকাশকে যদি বলা হয় ফল, তা হলে ৯৫ শতাংশের পিছিয়ে পড়া অবস্থাকে বলা যেতে পারে তার কারণ। এক শ্রেণির মানুষ আছেন, যাঁরা সমাজে থাকা শ্রেণিবিভাগ মানতে চান না, দেশটা যে ধনী-গরিবে, মালিক-মজুরে বিভক্ত তা মানতে চান না— উপরের আলোচ্য তথ্য কি তাঁরা অস্বীকার করতে পারেন? আর দেশটা যদি শ্রেণিবিভক্ত হয় তা হলে সরকার কোন শ্রেণির স্বার্থে শাসন করছে, এটা ভেবে দেখা কি জরুরি নয়?

শ্রমিক মালিকের স্বার্থ যে পরস্পরবিরোধী, এটা স্বীকার করে না বিজেপির শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ। এ ছাড়া রয়েছে, আরও কিছু দল, যারা শিল্পে শান্তি রক্ষার কুম্ভীরাশ্রু ফেলে শ্রমিক আন্দোলনের রাশ টেনে ধরে। শিল্পে অশান্তির কারণ যে শ্রমিকরা নন, মালিকি বঞ্চনাই যে শ্রমিকদের অশান্ত করে তোলে, বিক্ষুব্ধ করে তোলে, এ সব মানতে তারা চায় না। এই প্রতিবেদন তৈরির সময় ডুয়ার্সের ৭টি চা বাগান বন্ধ। পাহাড়ে বন্ধ ৮টি। মালিকরাই বন্ধ করে দিয়েছে। গত ১০ বছরে তুরতুরি চা বাগান ৫ বার বন্ধ হল। বাগানের শ্রমিক দুর্গা খেড়িয়ার কথায় ‘শ্রমিকদের মজুরি থেকে বোনাস কোনওটাই ঠিকমতো মিলত না। প্রায় ১২০ দিনের মজুরি বকেয়া রয়েছে শ্রমিকদের। প্রাপ্য না দিয়ে মালিক পালিয়ে গেল’। আজ শ্রমিকরা পরিবার নিয়ে পথে বসেছে। খাবে কী? কোথাও কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে মালিকি বঞ্চনার তীব্রতা বৃদ্ধি শ্রমিকদের আন্দোলনের দিকে ঠেলছে। সমস্ত কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকরা মালিকি বঞ্চনার শিকার। এর বিরুদ্ধে শ্রমিকরা আন্দোলনে ফেটে পড়ছে। শ্রমিকরা অধিকার রক্ষার দাবিতে সংগঠিত হচ্ছে। আগামী ৯ জুলাই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ভারতের এআইইউটিইউসি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত মঞ্চ। তার সমর্থনে দাঁড়িয়েছে কর্মচারীদের নানা সংগঠন। এস ইউ সি আই (সি) এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে।

শ্রমিক এবং মালিকের এই লড়াইয়ে জিতবে শ্রমিক শ্রেণি। কারণ সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ছে। শ্রমের ন্যায্য দাবিতে লড়ছে। তার লড়াই প্রগতির লড়াই। লড়াইয়ের প্রগতিশীল চরিত্রের জন্যই শ্রমিক জিতবে। দ্বিতীয় কারণটি হল— শ্রমিকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাঁদের সংখ্যাও ক্রমাগত বাড়ছে। পুঁজিবাদ তার অর্থনৈতিক নিয়মেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরোধী শক্তি হিসাবে শ্রমিক সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই শ্রমিক আন্দোলনের প্রাবল্য লক্ষ করা যাচ্ছে। ভারত তার বাইরে নয়। ভারতেও শ্রমিক বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে। শ্রম অধিকারের নিরিখে যে ভারত পিছিয়ে, সেখানে ধর্মঘট তো অবশ্যই তার স্বাভাবিক পরিণাম। এই ধর্মঘটের পাশে সাধারণ মানুষকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে।

প্রসূতি মৃত্যু বেশি কেন

একের পাতার পর

মধ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হল প্রসবের পরে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। এক তৃতীয়াংশেরও বেশি মাতৃমৃত্যুর এটাই কারণ। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ জনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসা শুরু করতে দেরি হচ্ছে— সঠিক পরিকাঠামোর অভাবে অথবা ট্রান্সফার হয়ে উন্নত পরিকাঠামো বিশিষ্ট হাসপাতালে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দেরি হওয়ার কারণে।

২) সমীক্ষায় দেখা গেছে বর্তমানে ভারতে ৫২ শতাংশের উপরে গর্ভবতী মহিলা মাঝারি থেকে মারাত্মক অ্যানিমিয়াতে ভোগে। আমাদের দেশে কিশোরীদের মধ্যে শতকরা ৬০ জন অ্যানিমিয়াতে ভোগেন। স্কুল স্তর থেকে আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট খাওয়ানো থেকে শুরু করে গর্ভবতী মহিলাদের আয়রন ফলিক অ্যাসিড ট্যাবলেট খাওয়ানোর কর্মসূচি থাকলেও গর্ভাবস্থায় ৫০ শতাংশের উপরে মহিলা মারাত্মক অ্যানিমিয়াতে ভোগেন। কারণ শুধুমাত্র আয়রন বড়ি খেয়ে অ্যানিমিয়া মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য দরকার রয়েছে প্রোটিন যুক্ত পুষ্টিকর খাবার। আমাদের দেশের অধিকাংশ মহিলা উপযুক্ত পুষ্টিকর খাবার না পাওয়ার ফলে শিকার হন অ্যানিমিয়ার। এ ছাড়াও নানা ধরনের ক্রনিক রোগের কারণে অ্যানিমিয়া তাঁদের সঙ্গী। আপামর মানুষের দৈনিক আয় ১৬৭ টাকারও কম। সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশেরই দিনে এক বেলা পেটভরা খাবার জোটে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য তারা পাবে কোথায়?

৩) এর পরে রয়েছে সেপসিস, এক্লেমশিয়া, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি, জন্ডিস ইত্যাদি রোগের ঠিকমতো চেকআপের ব্যবস্থার অভাব।

প্রাক প্রসবকালীন চেক আপ এবং বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নানা জটিলতা নির্ণয় করা সম্ভব এবং সময়মতো ব্যবস্থা নিলে প্রসবকালীন জটিলতাগুলো এড়িয়ে চলা যেতে পারে। প্রাক প্রসবকালীন ৪ টি চেকআপ এ জন্য জরুরি। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৪২ শতাংশ গর্ভবতী মহিলা প্রাক প্রসবকালীন ৪ টি চেকআপের সুযোগ পেয়ে থাকেন। চতুর্থ চেকআপের পরে এইসব গর্ভবতী মহিলাদের খোঁজ রাখার মতো সরকারি ব্যবস্থাপনা নেই। ফলে চতুর্থ চেকআপ পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলারা স্বাভাবিক থাকলেও পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ প্রসবের আগে পর্যন্ত তাদের নানা শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন ঘটে। কিছু ক্ষেত্রে নানা জটিলতা দেখা দেয়। সেই সবগুলো প্রাথমিকভাবে নির্ণয় করার মতো পরিকাঠামো রাজ্য সরকারের নেই। ফলে জটিলতা এড়ানো যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে প্রাক প্রসবকালীন পরিষেবা দেওয়ার পরিকাঠামো, যন্ত্রপাতির গুণমান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো যথাযথ রাখার ক্ষেত্রে রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের অবহেলা।

পশ্চিমবঙ্গে মাতৃমৃত্যুর ওপর সমীক্ষা থেকে দেখা যাচ্ছে যত মাতৃমৃত্যু হচ্ছে তার মধ্যে ৭০ শতাংশই সিজারের পরে হচ্ছে। সিজার পরবর্তী মৃত্যুর হার এসে দাঁড়িয়েছে এক লাখে ৩৩৮। দেখা গেছে পরিকাঠামো এবং দক্ষ ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাব রয়েছে সর্বত্রই। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি অপারেশন থিয়েটার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ওয়ার্ড নিয়মিতভাবে পরিশোধিত করা হয় না। বহু ক্ষেত্রে সিনিয়র চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতেই জুনিয়র চিকিৎসকরা অপারেশন করতে বাধ্য হন। অপারেশন পরবর্তী পরিচর্যা যথেষ্ট গুণমান সম্পন্ন হয় না। বহু ক্ষেত্রে প্রসূতি মা সঠিক পরিচর্যা পানও না, ফলে সেপসিস, অ্যাকিউট কিডনি ইনজুরি ইত্যাদির মতো অত্যন্ত মারণ সমস্যাগুলি দেখা দেয়। বহু ক্ষেত্রে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অকেজো হয়ে যায়। কলকাতার এসএসকেএম-এর মতো দু’একটি হাসপাতালকে বাদ দিলে রাজ্যে আর কোথাও কার্যত এই ধরনের জটিলতা চিকিৎসা করার পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। প্রসূতিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ওষুধপত্রের নিম্ন গুণমান এবং ভেজাল ওষুধ মাতৃমৃত্যুর হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। সম্প্রতি মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে নিম্নমানের স্যালাইনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে দুজন প্রসূতির মৃত্যু ঘটেছে।

নাবালিকা বিবাহ বৃদ্ধি

সম্প্রতি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যত প্রসূতির মৃত্যু ঘটছে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যায় রয়েছে কিশোরী মায়েরা। বাল্যবিবাহ বর্তমানে একটা সামাজিক অভিশাপ। অর্থনৈতিক চূড়ান্ত বিপর্যয় এবং সাংস্কৃতিক জগতের চূড়ান্ত অবক্ষয় আজ বাল্যবিবাহের সংখ্যা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে কৈশোর পেরোনোর আগেই গর্ভধারণ বাড়ছে। বাল্যবিবাহের নিরিখে দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গই দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে, ত্রিপুরার ঠিক পরে পরে। কিশোরী গর্ভধারণের হারও এ রাজ্যে অনেক বেশি। প্রায় ২৪ শতাংশ গর্ভবতী মহিলাই কিশোরী। অপুষ্টি, রক্তাল্পতায় ভোগা এবং অসম্পূর্ণ শারীরিক গঠনের জন্য এই বয়সে গর্ভধারণ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং এদের মধ্যে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। কন্যাশ্রী, রূপশ্রী ইত্যাদি নানা রকমের ভোটসর্বস্ব চটকদার সামাজিক পরিকল্পনা চালু করা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক চূড়ান্ত সংকট এবং সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এই কিশোরী গর্ভধারণের মতো শোচনীয় পরিণতিকে আটকাতে পারছে না।

কী করণীয়?

মাতৃমৃত্যু কমাতে চাই যথাযথ সরকারি সদিচ্ছা। সরকার যতদিন মানুষকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা না দেবে, তত দিন এ সমস্যা নির্মূল করা কঠিন। কিন্তু, পুঁজিবাদী শাসনে মানুষকে দেখা হয় লাভের পণ্য হিসাবে। ফলে জনস্বার্থে বরাদ্দ যথাযথ নয়। পূর্বতন সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় বা সোসালাইজড মেডিসিন যে সব দেশে চালু হয়েছিল সে সব দেশের সরকার মানুষকে সম্পদ হিসেবে গণ্য করার নীতি গ্রহণ করেছিল। চিকিৎসা ছিল বিনামূল্যে। আমাদের সরকারও যতদিন জনগণকে সম্পদ হিসেবে গণ্য না করবে, তত দিন মাতৃমৃত্যুর মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা কমানো সম্ভব হবে না। কিন্তু সরকারকে জনমুখী নীতি গ্রহণে বাধ্য করতে হলে দরকার ধারাবাহিক নাগরিক আন্দোলন।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব যেহেতু একটি বিপ্লব, তা প্রতিরোধের মুখে পড়বেই

মাও সে তুং

যদিও বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে কিন্তু তারা এখনও শোষক শ্রেণির পুরানো চিন্তা-ভাবনা, সংস্কৃতি, আচার, রীতি এবং অভ্যাসকে কাজে লাগিয়ে জনগণের মানসিকতা কলুষিত করার চেষ্টা করছে, তাদের মনন জগতকে দখল করার চেষ্টা করছে এবং এর মধ্য দিয়ে পুনরায় ক্ষমতায় ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছে। ঠিক এর বিপরীতটাই করতে হবে সর্বহারা শ্রেণিকে। আদর্শ, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, পুরনো অভ্যাস-আচরণ— সব ক্ষেত্রে বুর্জোয়া অনুপ্রবেশের চেষ্টাকে মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ করতে হবে সর্বহারা শ্রেণিকে এবং সর্বহারা শ্রেণির নতুন চিন্তা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, অভ্যাস-আচরণ দিয়ে সমগ্র সমাজের মননজগতকে পাল্টে দিতে হবে।

বর্তমানে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, এখন যাঁরা কর্তৃত্বের আসনে আছেন এবং যাঁরা পুঁজিবাদী পথের পথিক, তাঁদের বিরুদ্ধেসংগ্রাম করা, তাঁদের সমালোচনা করা এবং বুর্জোয়া পণ্ডিতদের সমালোচনা করা, সমস্ত রকম প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বিরুদ্ধতা করা এবং যারা ক্ষমতায় বসে এই ভাবধারা নিয়ে চলছে তাদের ও সকল শোষক শ্রেণির প্রতিভূদের ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা এবং এই পথে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি সহ উপরিকাঠামোর সমস্তটার রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ভিত্তির পরিপূরক করে তোলা, যার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিকাশের সংহতিকে ত্বরান্বিত করা যায়।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব যেহেতু একটি বিপ্লব, ফলে তা প্রতিরোধের মুখে পড়বেই। এই প্রতিরোধ প্রধানত আসে তাঁদের থেকে যাঁরা কর্তৃত্বের আসনে আছেন, যাঁরা পার্টির মধ্যে উঁচু জায়গায় গুটি গুটি পৌঁছে গেছেন এবং পুঁজিবাদের পথ ধরেছেন। এই প্রতিরোধ পুরনো সমাজ থেকে পাওয়া অভ্যাসের শক্তি থেকেও আসে। বর্তমানে এই বাধা বা প্রতিরোধ যথেষ্ট শক্তিশালী। কিন্তু শেষ বিচারে সাংস্কৃতিক বিপ্লব একটা অপ্রতিরোধ্য সাধারণ প্রবণতা।

এরকম বহু দৃষ্টান্ত ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়েছে যার দ্বারা বলা যায়, জনগণ সম্পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হলে এই প্রতিরোধ বা বাধাগুলো অচিরেই ভেঙে যাবে। বাধাগুলো যেহেতু যথেষ্ট শক্তিশালী তাই এই সংগ্রামে পরাজয় আসবে, বারবার পরাজয় ঘটবে। কিন্তু তাতে ক্ষতি হবে না কারণ এই সংগ্রাম সর্বহারা শ্রেণি ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণকে, বিশেষত যুব সম্প্রদায়কে আরও দৃঢ়চেতা করবে, অনেক শিক্ষা দেবে এবং অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধকরবে এবং তারা জানবে যে বিপ্লবের পথটা আঁকাবাঁকা, খুব মসৃণ নয়।

সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রসঙ্গে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির ১৬ পয়েন্ট ঘোষণা

‘আমি কেবল আমার দায়িত্ব পালন করছি’

গাজায় আমরা যা দেখছি, তা ভীষণ কষ্টদায়ক। এটা আমার শরীরে ও মনে ভীষণ আঘাত করছে। আমি স্পষ্ট করে বলতে চাই এটা কোনও আদর্শবাদ নয়। এটা ‘আমি ঠিক, তুমি ভুল’ নয়। এটা শুধুমাত্র জীবনের প্রতি ভালোবাসা। এটা আপনার প্রতিবেশীর যত্ন নেওয়া। আমরা হয়তো ভাবতে পারি যে চার বছরের ছেলেমেয়েরা বোমায় মারা যাচ্ছে অথবা হাসপাতালে মারা যাচ্ছে যেটা এখন আর হাসপাতালই নয় এবং আমরা ভাবতে পারি ওটা আমাদের ব্যাপার নয়। ঠিক আছে, আমরা সেটা ভাবতেই পারি যে এটা হয়তো আমাদের ব্যাপার নয়। কিন্তু সাবধান, পরেরটা আমাদেরই হবে। পরেরটা আমাদেরই চার-পাঁচ বছরের শিশুরাই হবে। গাজার দুঃস্বপ্ন শুরু হওয়ার পর থেকে আমি যখন আমার সন্তান মারিয়া, ম্যারিয়াস আর ভ্যালেন্টিনাকে প্রতিদিন সকালে দেখি, আমার সত্যিই ভয় হয়।

একটা গল্প মনে পড়ে যায়। একটা জঙ্গলে আগুন লেগেছে। সব প্রাণীই আতঙ্কিত, অসহায়। কিন্তু একটা ছোট্ট পাখি বারবার সমুদ্রে আসা যাওয়া করছে, সমুদ্র থেকে একফোঁটা করে জল তার ঠোঁটে করে নিয়ে আসছে। একটা সাপ হেসে বলে, ‘কেন ভাই? তুমি তো আগুন নেভাতে পারবে না।’ পাখিটা উত্তর দেয়, ‘হ্যাঁ, আমি জানি।’ সাপটা আবার জিজ্ঞেস করে, ‘তাহলে তুমি বারবার এটা কেন করছ?’ পাখিটা শেষবারের মতো বলে, ‘আমি কেবল আমার দায়িত্ব পালন করছি।’ পাখিটা জানে, সে আগুন নেভাতে পারবে না। কিন্তু সে কিছু না করেও থাকতে পারবে না। এমন এক জগতে, যা প্রায়ই বলে যে কোনও বদল আনার জন্য আমরা খুবই ছোট, সেই গল্প আমাকে মনে করিয়েদেয় যে একজনের শক্তি তার ব্যাপ্তিতে নয়, তার সিদ্ধান্তে। তার উপস্থিতিতে, তার নীরবতা ও স্থিরতাকে অস্বীকার করাই যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়।

ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি গ্রহণের পর ভাষণে বিশ্বখ্যাত ফুটবলার ও কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা

গণতন্ত্রের বুলিতে কংগ্রেস-বিজেপি কে কম!

২৫ জুন ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ পালন করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বিজেপি। তার জন্য রাজ্যে রাজ্যে রীতিমতো সরকারি নির্দেশ পাঠিয়েছে তারা। ১৯৭৫-এর এই দিনটিতেই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জারি করেছিলেন, ‘জরুরি অবস্থা’। এই ঘোষণায় স্থগিত হয়ে যায় সংবিধান প্রদত্ত সমস্ত মৌলিক অধিকার, নিষিদ্ধ হয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ, নিষিদ্ধ হয় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা, গলা টিপে ধরা হয় বাক স্বাধীনতার, সংবাদমাধ্যমের উপর জারি হয় সেন্সরশিপ, প্রায় সমস্ত বিরোধী নেতা রাতারাতি গ্রেপ্তার হন। বিচারবিভাগ, সংসদ সহ সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা খর্ব করে তাদের প্রশাসনের আজ্ঞাবহ করে তোলা হয়। জরুরি অবস্থার ২১ মাস ভারতের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত।

জরুরি অবস্থার ৫০ বছর

ঘোষিত এবং অঘোষিত জরুরি অবস্থা

২৫ জুন ‘সংবিধান হত্যা দিবস’ পালনে বিজেপি নেতারা নিশ্চয়ই এই উপলক্ষে নানা ভাষণ দেবেন, অনুষ্ঠান করবেন। কংগ্রেস কত অগণতান্ত্রিক তার ফিরিস্তি দেবেন। কিন্তু কী উদ্দেশ্যে? ইন্দিরা গান্ধীর দল কংগ্রেস এবং নরেন্দ্র-মোদি অমিত শাহের দল বিজেপি— কে বড় গণতন্ত্র হত্যাকারী, তার তুলনার জন্য কি? বিজেপি কিন্তু গণতন্ত্র রক্ষার শপথের কথা বলেনি, সংবিধান হত্যার প্রশ্ন তুলেছে। উল্লেখ্য যে সিপিএম-এর মতো বামপন্থী দলও এখন সংবিধান রক্ষার জন্য শপথ নিচ্ছেন। এর ভিত্তিতেই তাঁরা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু এ কথা কি ভোলা যায় যে, ইন্দিরা গান্ধী তাঁর যাবতীয় ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সংবিধানকে যথারীতি মাথায় করে রেখেই। আবার সংবিধানে মাথা ঠেকিয়ে, তাকে প্রণাম করতে করতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দল দেশে গণতন্ত্র হত্যার যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা অঘোষিত জরুরি অবস্থা ছাড়া কিছু নয়। আজকের ভারতে শাসকের বিরুদ্ধে সোশাল মিডিয়ায় একটা পোস্ট, সংবাদমাধ্যমে একটা সরকার বিরোধী লেখা, এনআরসি-সিএএ-র মতো আইনের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ সভায় অংশগ্রহণই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর কোনও সমালোচক ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত হলে তো সন্ত্রাস দমন আইন ‘ইউএপিএ’ এড়ানো তাঁর পক্ষে মুশকিল।

বিজেপি শাসনের দশ বছরে এ দেশে ১৩ জন সাংবাদিক খুন হয়েছেন, ১৫৪ জন সাংবাদিক গ্রেপ্তার হয়েছেন শুধু সংবাদ পরিবেশন করার কারণে। গত ৪ মে ‘আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা দিবস’ উপলক্ষে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক পত্রিকা ‘দ্য গার্ডিয়ান’ লিখেছে, ভারতে কোনও মন্ত্রী সরাসরি বাকস্বাধীনতা হরণের নির্দেশ জারি করেননি ঠিক কথা, কিন্তু সাংবাদিকদের একটা ভয়ের বাতাবরণেই কাজ করে চলতে হয়। সেই কারণেই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার নিরিখে ভারতের স্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৬১-তে নেমেছে। বিজেপি আজ জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে ভাষণ দিচ্ছে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোটে লড়তে তাদের এই প্রচার প্রয়োজন। অথচ, দু-জনের কাজের পার্থক্য কোথায়? কংগ্রেস সরকার সন্ত্রাসবাদের জুজু দেখিয়ে দেশের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছিল দানবীয় আইন ইউএপিএ। বিজেপি সরকার তাকে আরও মারাত্মক দমনমূলক করে তুলেছে। বিজেপি রাজত্বে ২০১৪ থেকে ২০২২-এর মধ্যে ৮ হাজার ৭০০-র বেশি মামলা ইউএপিএ-তে রুজু করা হলেও তার মাত্র ২ শতাংশের ক্ষেত্রে কোনও ফয়সলা হতে পেরেছে। যা দেখিয়ে দেয় সন্ত্রাস দমন নয়, অপছন্দের ব্যক্তিকে জেলে ভরে রাখার জন্যই এই আইনকে কাজে লাগিয়ে চলেছে বিজেপি সরকার। কংগ্রেসের হাত ধরে ফ্যাসিবাদের যে ভিত ভারতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল এ দেশের পুঁজিপতি শ্রেণি, সেই দায়িত্ব গ্রহণ করে বিজেপি তাকে আরও দৃঢ় করছে।

প্রচার আছে যে, জরুরি অবস্থার সময় নাকি আরএসএস তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগিয়ে ছিল! কিন্তু ইতিহাস খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে বিজেপির অভিভাবক আরএসএস জরুরি অবস্থার সময় নানা পর্যায়ে কার্যত ইন্দিরা গান্ধীকে সাহায্যই করেছে। একদল এখন বামপন্থার নাম করে ‘নয়া’ এবং ‘পুরাতন’ ফ্যাসিবাদী শাসনের পার্থক্য টেনে কংগ্রেস এবং বিজেপির মধ্যে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ভোটসঙ্গী খুঁজছেন। কিন্তু পার্থক্য কোথায়, যে তা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সে দিনের প্রেক্ষাপট

কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে ১৯৬০-এর দশকের শেষ থেকেই রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভ আন্দোলন মাথা তুলছিল। কংগ্রেস দ্রুত জনসমর্থন হারাচ্ছিল। ফলে, ১৯৭১-এ ইন্দিরা গান্ধী তথা কংগ্রেসকে লোকসভা এবং কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা ভোটে জিততে ব্যাপক রিগিং ও নির্লজ্জভাবে প্রশাসন যন্ত্রকে কাজে লাগাতে হয়। এর বিরুদ্ধে মামলা হলে ১৯৭৪-এর ১২ জুন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি জগমোহনলাল সিনহা নির্বাচনে সরকারি ক্ষমতা অপব্যবহারের অভিযোগে ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনকে বেআইনি বলে ঘোষণা করেন। সে সময় সমাজবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অপশাসন ও দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন সারা দেশে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। বিহার, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট সহ একাধিক রাজ্যে পুলিশের গুলির সামনে দাঁড়িয়েও ছাত্র-যুবরা আন্দোলনে এগিয়ে আসেন। ইন্দিরা গান্ধী চেয়েছিলেন জরুরি অবস্থা জারি করে একদিকে এই আন্দোলনকে গলা টিপে মারতে, অন্যদিকে আদালতের রায় অগ্রাহ্য করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে। সে দিন জয়প্রকাশ

ছয়ের পাতায় দেখুন

মুনাফা-লালসার মাশুল দিলেন বিমানযাত্রীরা

অপেক্ষা, শুধু এক বুক অপেক্ষা নিয়েই দিন কাটাচ্ছেন বিমান দুর্ঘটনায় মৃতের পরিজনরা। ১০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও (লেখা তৈরি হওয়া পর্যন্ত) আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় সব মৃতদেহ শনাক্তকরণ হল না। ভাঙা হাত, পায়ের টুকরো বা কোনও প্রমাণচিহ্ন পৌঁছল না পরিজনদের কাছে।

১২ জুন গুজরাটের আমেদাবাদের মেঘানিনগরে ভেঙে পড়া এয়ার ইন্ডিয়ার লন্ডনগামী বিমানের ২৪১ জন যাত্রী সহ মেডিকেল হোস্টেল ও স্থানীয় মানুষ ধরে প্রায় ৩০০ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। মৃতদের পরিজনেরা ডিএনএ বা অন্য প্রমাণ দিলেও তা মিলিয়ে মৃতদেহ শনাক্তকরণের কাজ চলছে ঢিমেতালে। আহমেদাবাদ সিভিল হাসপাতালের চিকিৎসক ও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা এই কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু পরিজনদের নিশ্চিন্ত করার জন্য গুজরাট সরকারের কি উদ্যোগী হয়ে প্রয়োজনে বাইরের রাজ্য থেকে বিশেষজ্ঞ এনে কাজটা দ্রুত সম্পূর্ণ করা দরকার ছিল না? শোকবিহ্বল অবস্থায় নিহতদের পরিজনেরা একবার হাসপাতাল একবার মর্গে ছুটে বেড়াচ্ছেন, কবে কখন মৃতদেহ পাওয়া যাবে তা জানতে পারছে না অনেকে। স্থানীয় যাঁরা নিখোঁজ বা মারা গিয়েছেন, তাদের পরিজনদের অবস্থা তো আরও কঠিন। কারণ, বিমান যাত্রীর মতো তাদের তো আর কোনও নামের তালিকা নেই। ফলে থানা-পুলিশ-মর্গ করেই তাদের দিন চলে যাচ্ছে, খোঁজ মিলছে না। মৃতদেহ পরিবহণে গাড়ি ও কফিনের অভাব— সর্বত্র একটা অব্যবস্থা, অগোছালো ভাব প্রকট হয়ে উঠেছে।

দুর্ঘটনার তদন্ত এবং তার ব্যবস্থাপনা নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছে যেগুলি কোনওটাই ফেলে দেওয়ার মতো নয়! অথচ সরকার কিংবা টাটা পরিচালিত এয়ার ইন্ডিয়া এগুলোতে কর্ণপাতই করছে না। তদন্ত চাপা দিতেই কি এই আচরণ?

এয়ার ইন্ডিয়াকে টাটার হাতে বেচে দেওয়ার সময় পরিকাঠামো ও পরিষেবা উন্নয়নের নানা গল্প শোনানো হয়েছিল। অনেকে আবার বলে থাকেন, বেসরকারি হলেই পরিষেবা উন্নত হয়। আর টাটা কোম্পানির নামে তো একদল একেবারে গদগদ হয়ে পড়েন। অথচ টাটার হাতে গিয়ে পরিকাঠামোর হাল কি তা সাম্প্রতিক ঘটনায় বোঝা যায়। নিরাপত্তায় গাফিলতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই এয়ার ইন্ডিয়ার তিন উচ্চপদস্থ আধিকারিককে সরানোর নির্দেশ দিয়েছে ভারতের বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা ডিজিসিএ। এই তিন আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিমান ও বিমানকর্মীদের নিরাপত্তা বিষয়ক একাধিক গাফিলতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক লাইসেন্স ছাড়াই কাউকে বিমানে কাজের দায়িত্ব দেওয়া, টানা কাজের পর পর্যাপ্ত বিশ্রাম না দিয়ে পরবর্তী বিমানের দায়িত্বে পাঠানোর মতো গাফিলতি।

দুর্ঘটনার পর উঠে আসছে নানা তথ্য। প্রয়োজনের তুলনায় বিমানকর্মীর সংখ্যা কম, নেই বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড কর্মী। বিমান ওড়ার সবুজ সঙ্কেত দেওয়া, ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বা বিমানচালকের সংখ্যায় রয়েছে ব্যাপক ঘাটতি। নিরাপত্তায় গলদ রয়েছে যথেষ্ট। সংস্থার মুনাফা দিন দিন বাড়লেও যাত্রীদের নিরাপত্তাজনিত খাতে ব্যয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম। বেসরকারি কোম্পানি টাটার, কিন্তু সরকারের বিমান নিয়ন্ত্রক সংস্থা কি তার দায় এড়াতে পারে? ডিজিসিএ কার নির্দেশে চোখ বুজে থেকেছে। এতগুলি মানুষের মৃত্যু না হলে কি তারা আদৌ কোনও পদক্ষেপ করত!

দুর্ঘটনার পর এয়ার ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে। যদিও এই টাকার অনেক বেশি তারা বিমা কোম্পানির থেকে পেয়ে যাবে। তা ছাড়া ক্ষতিপূরণ দিয়েই কি তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়? যদি আবারও আর্থিক কারণ দেখিয়ে কিংবা কর্মী সংখ্যা কমের অজুহাতে যাত্রী নিরাপত্তার সাথে আপস করা হয়, তবে আবারও একই ঘটনা ঘটবে। সরকারের দায়ও এতে এতটুক কমে না। বিশ্বে বিমান পরিবহণে যাত্রী সংখ্যার নিরিখে তৃতীয় ভারত। এর থেকে ভালই লাভের কড়ি ঘরে আসে বেসরকারি সংস্থাগুলির। সরকারও বহু কোটি টাকা রাজস্ব পায় বেসরকারি বিমান পরিবহণ সংস্থাগুলি থেকে। তা হলে সেগুলির নজরদারিতে সরকারের ভূমিকায় এত অবহেলা কেন? প্রধানমন্ত্রী দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে ছবি তুললেই কি তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়?

মুনাফার স্বার্থে মালিকরা মানুষের জীবনকে কতটা বিপদে ঠেলে দিতে পারে তা আজ বিমান, রেল, বাস, জাহাজ পরিবহণ, হাসপাতাল পরিষেবা সহ সব ক্ষেত্রে প্রকট হচ্ছে। কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদী হামলার পর ভীত সন্ত্রস্ত পর্যটকদের লুঠ করতে কোনও বিমান কোম্পানি পিছিয়ে ছিল না। টাটারাও কিছু কম যায়নি এই লুঠের কারবারে। ফলে তারা মুনাফা তুলতে যাত্রীদের নিরাপত্তার তোয়াক্কা করে না, এ তো দেখাই যাচ্ছে। কর্মী সংখ্যার অভাবে অনেক সময়ই অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করা হয় বেসরকারি ক্ষেত্রে (আইএলও-র নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে), তা তো সরকারের অজানা নয়। বারবার অভিযোগ উঠছে, সরকারি হাতে থাকার সময় এয়ার ইন্ডিয়ার দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি গ্রাউন্ড স্টাফদের বদলে এখন টাটারা ভরসা করছে চুক্তিভিত্তিক অদক্ষ কর্মীদের ওপর, যাদের সংখ্যাও পর্যাপ্ত নয়। ফলে সামান্য কারণে বিমান চলাচলে দেরি এখন খুব সাধারণ ঘটনা।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বোয়িং-৭৮৭ ড্রিমলাইনার মডেলটির 'প্রযুক্তিগত ত্রুটি' এর আগেও আলোচনায় এসেছে। জানা গেছে, ২০১৩ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাইয়ের মধ্যে একাধিকবার এই মডেলের লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তারপর এই মডেলকে বেশ কিছুদিন বসিয়ে দিয়েছিল মার্কিন বেসরকারি বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফএএ। তা সত্ত্বেও ডিজিসিএ সেগুলি চালানোর অনুমতি দিল কেন? বিমান পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যদি মানুষের প্রাণের থেকে মুনাফার মূল্য বেশি হয়ে ওঠে, তখন তার মাশুল চোকাতে হয় অনেক গুণ বেশি। যতদিন রেল-বিমানের মতো পরিষেবা পুঁজিবাদী বাজারের লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে, ততদিন এর মাশুল গুনতে হবে অসহায় যাত্রী ও তাদের পরিজনদেরই।

স্মার্ট মিটার বন্ধ ঃ অভিনন্দন জানিয়ে সভা

এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) এবং বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতি অ্যাবেকার লাগাতার আন্দোলনের চাপে সম্প্রতি বিধানসভায় রাজ্য সরকারের তরফে ঘোষণা করা হয় রাজ্যে আর স্মার্ট মিটার লাগানো হবে না। আন্দোলনের এই জয়ে জনগণকে অভিনন্দন জানিয়ে পূর্ব মেদিনীপুর তমলুকের হরির বাজার এবং বড়বাজার এলাকায় ১৫ জুন মিছিল করে এস ইউ সি আই (সি)।

এই জেলার মেচেদা, খঞ্চি, নোনাকুড়ি, চণ্ডীপুর ব্রজলালচক, পাঁশকুড়া, মনসাপুকুরহাট, ভোগপুর, তমলুক (ছবি), নন্দকুমার, এগরা, জঁফুলি প্রভৃতি স্থানে ১৪ জুন অ্যাবেকার পক্ষ থেকে অভিনন্দন সভা করা হয়।

মদবিরোধী মিছিল পুরুলিয়ায়

পুরুলিয়া জেলার বলরামপুরে মদবিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে মদ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করার দাবিতে ১১ জুন বলরামপুরের বিডিও অফিস এবং থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দুই শতাধিক মানুষ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। নেতৃত্ব দেন রাজেশ মাঝি, ছবিরানি মাহাত, চুমকি মাহাত, মণিবালা সিং সর্দার, রিনা সহিস ও দীপক কুমার।

জেলায় জেলায় যুব সম্মেলন

মৈপীঠ ঃ এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে ১৫ জুন দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মৈপীঠ আঞ্চলিক যুব সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেডস জয়ন্ত জানা, নিখিল মণ্ডল ও জেলা সভাপতি অমল মিস্ত্রী। এই উপলক্ষে একটি রোড রেস হয়। প্রকাশ্য সমাবেশে প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। কমরেডস চন্দন আচার্যকে সভাপতি, মহাদেব হালদারকে সম্পাদক ও বুদ্ধদেব মাইতিকে কোষাধ্যক্ষ করে ১৪ জনের যুব কমিটি গঠিত হয়।

সাহেবের হাট ঃ সমস্ত বেকারের কাজ, যোগ্য শিক্ষকদের অবিলম্বে স্কুলে ফেরানোর ব্যবস্থা, প্রতি বছর এসএসসি পরীক্ষা নেওয়া এবং মদ ও মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করার দাবিতে ২২ জুন কোচবিহারের সাহেবের হাটে অনুষ্ঠিত হল লোকাল যুব সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক সুমন পণ্ডিত, জেলা সভাপতি বাদল পাল, হরিশঙ্কর রায় প্রমুখ। সম্মেলন থেকে একটি লোকাল কমিটি গঠিত হয়।

মিড-ডে মিল কর্মীদের পথ-কুকুরদেরও খাওয়াতে হবে!

পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন ২০ জুন সার্কুলার দিয়ে জানিয়েছে, স্কুলের পাশের পথ কুকুরদের খাওয়াতে হবে মিড ডে মিল কর্মীদেরই। এর তীব্র নিন্দা করে ২২ জুন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস এক বিবৃতিতে বলেন, আশ্চর্যের বিষয় যে মিড-ডে মিল কর্মীরা ছাত্র-ছাত্রীদের রান্না ও খাবার পরিবেশন করেন, তাঁদের খাবারের জন্য কোনও বরাদ্দ করা হয়নি। কিন্তু পথ-কুকুরদের খাবারের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। এ জন্য এই কর্মীদের মধ্য থেকেই দায়িত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়াও কুকুরদের ভ্যাকসিন দেওয়া ও নির্বীজকরণের দায়িত্বও নিতে হবে মিড-ডে মিল কর্মীদের। স্কুল ছাত্রদের খাবারের সাথে পথ-কুকুরদের খাওয়ানোর এই পরিকল্পনার ফলে স্কুলের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হবে। তিনি দাবি করেন, পথ-কুকুরদের খাওয়ানোর জন্য আলাদা কর্মী নিয়োগ করতে হবে এবং শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি দিতে হবে।

ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল আমেরিকা

রবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস, আগুন। লস এঞ্জেলেসের রাজপথ উত্তপ্ত। মাত্র কিছুদিন আগেই আগুন ছড়িয়েছে লস এঞ্জেলেস থেকে নিউ ইয়র্ক, টেক্সাস, সানফ্রান্সিস্কো, শিকাগো, সিয়াটেল প্রভৃতি বড় বড় শহরে। ন্যাশনাল গার্ড, অর্থাৎ আমেরিকান সেনার রিজার্ভ বাহিনী রাজপথ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে।

ট্রাম্পের কড়া অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বিক্ষোভ ছড়িয়েছে আমেরিকার শহরে শহরে। গত নির্বাচনে জেতার জন্য এই নীতিকেই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্টের

ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ লস এঞ্জেলেসে

গদিতে বসার পর কড়া হাতে এই নীতিকে কার্যকর করার কাজে তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু বিপত্তি বেঁধেছে এখানেই।

একটা ঘটনার সাহায্যে তা বোঝা যেতে পারে। এক সময় ট্রাম্প সমর্থক ছিলেন লিয়ান পেজ। তিনি প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হন কিউবান তরুণ, ২৮ বছর বয়সী আলিয়ান মেন্ডেজ আগুইলার-এর সাথে। ২০১৯ সালে আলিয়ান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং সমস্ত আইন মেনেই ওই দেশে বসবাস শুরু করেন ও লিয়ানকে বিয়ে করেন। আলিয়ান তাঁর স্ত্রী ও তাঁর আগের পক্ষের প্রতিবন্ধী বড় ছেলের যত্ন করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং তাঁদেরও বর্তমানে তিন বছরের এক শিশুকন্যা আছে। কিন্তু বর্তমানে ট্রাম্পের কড়া অভিবাসন নীতির ফলে এ বছরের ২৪ এপ্রিল আলিয়ানকে কিউবা ফেরত পাঠানো হয়। স্বভাবতই লিয়ান, তাঁর প্রতিবন্ধী ছেলে ও শিশুকন্যাকে নিয়ে কী ধরনের সঙ্কটে মধ্যে পড়তে পারে বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই অভিবাসন নীতি যখন ঘোষণা হয়, লিয়ানের ধারণা ছিল, এটা কেবল অপরাধীদের বহিষ্কার করতে কার্যকরী হবে। তাঁর স্বামী আলিয়ানের অপরাধমূলক কোনও ইতিহাস নেই। তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েই ট্রাম্পকে ক্ষমতায় নিয়ে আসতে সমর্থন করেছেন। জনগণের ন্যূনতম চাহিদাগুলি পূরণে ব্যর্থ পুঁজিবাদী শাসকরা জনরোষ থেকে বাঁচতে কখনও সংকটের দায় চাপায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঘাড়ে, কখনও অভিবাসীদের ঘাড়ে। তারা যে পুঁজিপতি শ্রেণির সেবাদাস, জনগণের দুর্দশার জন্য সেই শ্রেণির ভূমিকাকে আড়াল করে, জনগণের এক অংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নির্বাচনী লড়াইতে উৎরে যাওয়ার কৌশল নেয়। ক্ষমতায় যাওয়ার পর তাদের আসল চেহারা প্রকাশ পায়। জনস্বার্থের নামে একটার পর একটা পদক্ষেপ নিয়ে আসলে তারা জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, তাদের উপর জনবিরোধী নীতি চাপিয়ে দেয়। বর্তমানে আমেরিকায় যে বিক্ষোভের আগুন শহর থেকে শহরে ছড়িয়ে পড়েছে তার পিছনে লিয়ান-আলিয়ানদের মতো এরকম অসংখ্য দুঃখজনক অমানবিক ঘটনা আছে। বিক্ষোভকারীরা কেন এত মরিয়া, কেন তারা ট্রাম্পের পুলিশ মিলিটারির অত্যাচারকেও পরোয়া করছে না তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। সে দেশের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-এর কাজকর্ম এমনই আতঙ্ক ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে যে, ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে যেতে ভয় পাচ্ছে, কারণ স্কুলের পার্কিং থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনার তারা প্রত্যক্ষদর্শী। আসন্ন সন্তানসম্ভবা মহিলাকে পর্যন্ত তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাচ্চাদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। অভিবাসন নীতি কার্যকর করার নামে, বেআইনি অভিবাসী আখ্যা দিয়ে যে কোনও সময় যে কোনও জায়গা থেকে, যে কোনও পরিস্থিতিতে মানুষকে তুলে নিয়ে যাওয়ার ফলে, সাধারণ মানুষের মনে একটা তীব্র ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। যারা ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী তারা ছাড়াও যে অসংখ্য মানুষ জীবন জীবিকার সন্ধানে কোনও না কোনও সময় মার্কিন সরকারের অনুমতিক্রমে কারখানা, হাসপাতাল, সাফাই কর্মী, রেস্টুরেন্ট কর্মী, মেকানিক সহ নানা বৃত্তির কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন, এমনকি ভোটদানের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছিলেন তাঁরা আজ এই সঙ্কটের সম্মুখীন। বছরের পর বছর এই সব শ্রমিকদের সস্তা শ্রম কাজে লাগিয়ে আমেরিকার পুঁজিপতি শ্রেণি লাভের পাহাড় গড়েছে, আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ ক্রমশ শক্তিশালী হয়েছে, দেশে দেশে পুঁজির দাপট বাড়িয়েছে। নিজের দেশে অর্থনীতির সামরিকীকরণ করেছে। চূড়ান্ত ফ্যাসিবাদের জমি প্রস্তুত করেছে। কিন্তু পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ তীব্র সঙ্কট ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে। এতদিন 'সিবিপিআই' অ্যাপের মাধ্যমে অন্য দেশের মানুষদের দেশে ঢুকতে দেওয়া, আশ্রয় দেওয়া এবং তাদের সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করার কাজ চালাতো আমেরিকা। অভিবাসন নীতি প্রয়োগের প্রথম ধাপেই সেই অ্যাপটি বাতিল করে দেওয়া হয়। এমনকি ট্রাম্প, এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি ও অভিবাসীদের সীমান্ত অতিক্রম বন্ধ করার জন্য সামরিক বাহিনী ব্যবহার করা শুরু করেছেন। এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়া আমেরিকার প্রশাসনের আর যেন কোনও উপায় নেই। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের অমোঘ সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে আজ আরও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিক সংখ্যা কমাতে চায়। যে সকল মানুষের সস্তা শ্রমের বিনিময়ে দুহাত ভরে বিপুল মুনাফা অর্জন করেছে, আজ সে যথেচ্ছ এ আই ব্যবহারের দিকে এগোচ্ছে। কোনও নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। এতদিন যে মানুষদের সস্তা শ্রমকে নিংড়ে কাজে লাগিয়েছে, প্রয়োজনে আশ্রয় দিয়েছে আজ সেই মানুষগুলো হয়ে পড়েছে সমাজের বোঝা! তাই ট্রাম্প চান, 'অচিরেই এই জঞ্জালমুক্ত করতে'। তাঁর সাফ জবাব, লস এঞ্জেলেসকে আবার 'শান্তিপূর্ণ পরিষ্কার শহর' করে তুলতে চান তিনি।

বিরোধীদের সমালোচনায় ও আজ তিনি দমছেন না। উল্টে হুমকি দিচ্ছেন, 'সেনাদের গায়ে যদি থুতু ছেটাও, আমরাও মারতে দ্বিধা করবো না'। যে কোনও মূল্যে এই বিক্ষোভকে দমন করতে তিনি বদ্ধপরিকর। আবার মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে দেশের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার দুর্নীতির খেলাও চলছে তলে তলে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি দেশে দেশে যুদ্ধ বাঁধিয়ে, যুদ্ধের ইন্ধন জুগিয়ে নিজের দেশের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভকেও আজ প্রশমিত করতে পারছে না।

ত্রিপুরায় বিদ্যুৎগ্রাহক আন্দোলন

স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে আগরতলায় স্বাক্ষর সংগ্রহ করছেন ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশনের স্বেচ্ছাসেবকরা। ২০ জুন

সম্মানজনক ভাতার দাবিতে জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা সংস্থান মিশন (এন আর এল এম)-এর সক্রিয় মহিলা সদস্যরা ছত্রিশগড়ের কঙ্করে কালেক্টর অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখান। মিছিলের শুরুতে বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি রাজ্য ইনচার্জ কমরেড বিশ্বজিৎ হারোড়ে ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

পাঁশকুড়ায় বিডিও ডেপুটেশন

পূর্ব মেদিনীপুরে নিউ কাঁসাইয়ের ভেঙে যাওয়া নদীবাঁধের জদরা-গড় পুরুষোত্তমপুর-মানুর প্রভৃতি স্থানগুলি মজবুত করে নির্মাণ সহ নদীবাঁধের সমস্ত গর্ত জরুরি ভিত্তিতে মেরামত, বর্ষার আগে নিকাশি খাল সংস্কার, স্লুইসগেটগুলি রক্ষণাবেক্ষণ, পাঁশকুড়া স্টেশন বাজার সংলগ্ন এলাকার সুষ্ঠু জলনিকাশি সমস্যার সমাধানে মাস্টার ড্রেনেজ স্কিম রূপায়ণ প্রভৃতি দাবিতে ১২ জুন পাঁশকুড়া বন্যা প্রতিরোধ ও খাল সংস্কার সংগ্রাম সমিতির পক্ষ থেকে বিডিও-র কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মার্কিন হামলার নিন্দা

একের পাতার পর

রুখে দাঁড়িয়েছে। ইজরায়েলকে দিয়ে হামলা চালিয়ে ইরানকে বশ মানাতে ব্যর্থ হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এখন সরাসরি ইরানকে আক্রমণ করেছে। আমরা ইরানের উপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই নিষ্ঠুর হামলা অবিলম্বে বন্ধকরার দাবি জানাচ্ছি। আমরা মনে করি এই হামলা কেবল ইরানের উপর নয়, বরং সমগ্র মানবজাতি ও বিশ্বশান্তির উপর আক্রমণ। আমরা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দানবদের এই জঘন্য আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার হওয়ার জন্য আবেদন জানাই।

মুরারই বিডিও-তে বিক্ষোভ

একের পাতার পর

জয়ন্ত সাহা, বীরভূম জেলা সম্পাদক কমরেড আনসারুল শেখ প্রমুখ। শ্রমিকরা বিডিও অফিসে ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ঢুকে পড়ে বিক্ষোভ দেখান। চলে বিক্ষোভ সভা। কমরেড এ এল গুপ্তার নেতৃত্বে ৯ জনের প্রতিনিধি দল বিডিও এবং বিএল অ্যান্ড এলআরও-এর কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আধিকারিকরা সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণের আশ্বাস দেন। কমরেড গুপ্তা উপস্থিত শ্রমিকদের লাগাতার ও তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

গণতন্ত্রের বুলিতে কে কম!

তিনের পাতার পর

নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলনের পাশে একমাত্র এস ইউ সি আই (সি) ছাড়া অন্য কোনও বামপন্থী দল দাঁড়ায়নি। বামপন্থীরা সম্মিলিত ভাবে এই আন্দোলনে এলে আন্দোলনে বামপন্থী প্রভাব তৈরির সুযোগ তৈরি হতে পারত। কিন্তু সিপিএম-সিপিআই না আসায় সে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। এই শূন্যতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে জনসংঘ এবং আরএসএস সর্বভারতীয় স্তরে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা কিছুদিন ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে নানা গরম গরম স্লোগানও তোলে।

আরএসএস প্রধানের ইন্দিরা স্তুতি

ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থার শুরুতেই বহু সংগঠনের সাথে আরএসএসকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। প্রথমে আরএসএস-জনসংঘ এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের ডাক দিলেও নেতা-কর্মীরা গ্রেপ্তার হওয়ার পরেই তাদের নেতারা পিছনের দরজা দিয়ে ইন্দিরা সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ার ব্যবস্থা করতে থাকেন। ২৫ জুন মধ্য রাতেই অটল বিহারী বাজপেয়ী, মোরারজি দেশাই সহ অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কিন্তু সত্যটা হল, ওই একই সময়ে গ্রেপ্তার হওয়া লোহিয়াপন্থী, সমাজবাদী, কিংবা বামপন্থী দলগুলির অনেক নেতা দীর্ঘ সময় কারাবাসে কাটালেও গ্রেপ্তার হওয়ার কয়েক দিন বাদেই বাজপেয়ীজি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে প্যারোলে ছাড়া পেয়ে যান। বিজেপি নেতা সুব্রহ্মণ্যম স্বামী তাঁর 'দ্য আনলার্ন্ট লেসনস অফ ইমার্জেন্সি' প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, বাজপেয়ীজি প্রতিশ্রুতি দেন, মুক্তি পেলে তিনি কোনও রকম সরকার বিরোধিতা করবেন না। তিনি পরবর্তী ২০ মাস গৃহবন্দি থাকলেও তাঁর সাথে কারও দেখা করার ওপরেও কার্যত কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না। স্বামী দেখিয়েছেন, ইন্দিরা গান্ধী ঠিক যেমনটা চেয়েছিলেন বাজপেয়ীজি সে সময় ঠিক সেই রকম আচরণই করেছেন (দ্য হিন্দু, ১৩.০৬.২০০০)।

আরএসএসের তৎকালীন প্রধান বা সরসংঘচালক বালাসাহেব দেওরস গ্রেপ্তার হওয়ার পর তিন তিনটি চিঠি লিখে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে কার্যত কাকুতি মিনতি করেছেন, আরএসএস-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিন এবং আমায় ক্ষমা করুন। ১৯৭৫-এর ২২ আগস্ট, ১০ নভেম্বর এবং পরের বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি লেখা তিনটি চিঠির সবকটিতেই তিনি ইন্দিরা গান্ধীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তিনি ইন্দিরাজির সঙ্গে দেখা করার অভিলাষও প্রকাশ করেছিলেন। কখনওই তিনি জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ার অনুরোধ করেননি। বরং তিনি লিখেছেন, নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে আরএসএসের লক্ষাধিক সদস্য সরকারের কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তিনি ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ আচার্য বিনোবা ভাবেকে কাতর অনুরোধ জানিয়েছিলেন, আপনি ইন্দিরা গান্ধীকে বোঝান— আরএসএস ইন্দিরাজির পরিকল্পনায় এবং নেতৃত্বে দেশের অগ্রগতির কাজে অংশ নিতে প্রস্তুত। (হাউ আরএসএস বিট্রেড অ্যান্টি ইমার্জেন্সি স্ট্রাগল, সামসুল ইসলাম, ফ্রন্টিয়ার, ১৪.০৬.২০১৯ এবং দ্য ওয়্যার, শিবসুন্দর লিখিত প্রবন্ধ, ২৯.০৬.২০২৪)

'মাফিনামা'

জরুরি অবস্থা জারির এক বছর পূর্তিতে ২৫ জুন ১৯৭৬ উত্তরপ্রদেশের জনসঙ্ঘ ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে জানায়, তারা আর ইন্দিরা সরকারের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করবে না। উল্লেখ্য যে, এই জনসঙ্ঘই ১৯৮০-তে নাম পাল্টে হয় বিজেপি। একাধিক লেখক এবং সাংবাদিক দেখিয়েছেন, আরএসএস কর্মীরা জেলে যাওয়ার পর থেকেই তাদের নেতৃত্ব বন্দি কর্মীদের জন্য তাঁরা 'মাফিনামা' বা ক্ষমার আবেদন পেশ করার ব্যবস্থা করে দেন। বালাসাহেব দেওরসের সাথে পুণের ইয়েরাভাদা জেলে থাকা বাবা আদভ তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন, একাধিকবার রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য জেলে ক্ষমার আবেদনের প্রোফর্মা বিলি করা হয়েছে। অন্য দলের নেতা-কর্মীরা বেশিরভাগই তা প্রত্যাখ্যান করলেও আরএসএস কর্মীরা সংগঠিতভাবে এই 'মাফি নামা'য় সই করে সরকারের কাছে ক্ষমা চেয়ে এক-দুই মাসের মধ্যেই জেলের বাইরে বেরিয়ে আসেন। জরুরি অবস্থার শেষ দিকে ১৯৭৭-এর জানুয়ারিতে আরএসএস এবং ইন্দিরাজির মধ্যে পূর্ণাঙ্গ চুক্তির ফলে বাকি সব আরএসএস কর্মীরই 'মাফি নামা'-তে সই করার সিদ্ধান্ত হয়। যদিও কিছু দিনের মধ্যই ইন্দিরাজি জরুরি অবস্থা তুলে নেওয়ায় তার আর দরকার হয়নি।

পরবর্তীকালে গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্রে সরকারে থাকার সময় বিজেপি জরুরি অবস্থায় জেল বন্দিদের জন্য পেনশন চালু করেছে। যারা এক মাসের বেশি জেলে থেকেছেন, তাদের জন্য মাসে ১০ হাজার টাকা, একমাস বা তার কম থাকলে ৫ হাজার টাকা। এক-দেড়মাস জেল-বাস করেই আরএসএস কর্মীরা সরকারি পেনশন ভোগ করে চলেছেন। যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পেনশনের তালিকায় একজন আরএসএস কর্মীর নামও পাওয়া যাবে না, কারণ আরএসএস আগাগোড়া ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপক্ষে ছিল। ইন্দিরা গান্ধীও আরএসএস নেতাদের প্রকৃত মনোভাব জানতেন। ১৯৭১-এ প্রবল কংগ্রেসী সন্ত্রাসে সারা দেশে সমস্ত বিরোধী দলের টুঁটি টিপে মারার সময়কালেও কংগ্রেস তথা ইন্দিরাজির অকুণ্ঠ প্রশংসায় সোচ্চার ছিলেন আরএসএস নেতারা। ইন্দিরা জমানার সবচেয়ে ঘৃণিত কাজগুলির একটি ছিল ইন্দিরা-সঞ্জয় গান্ধীর যৌথ পরিকল্পনায় '২০ দফা কর্মসূচি'-র নামে গরিব বস্তিবাসী মানুষ ও সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালানো। এর জন্য আরএসএস ইন্দিরা গান্ধীর প্রশংসা করেছিল। ১৯৭৪-এ আরএসএসের গুরুজি মাধবরাও সদাশিব গোলওয়ালকর এক চিঠিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর প্রচুর প্রশংসা করে বলেছিলেন, আপনার হাতেই সামরিক তাকতে শক্তিশালী ভারত তৈরি হচ্ছে। (এনডি টিভি, ১.০৮.২০২৩)

ইন্দিরাজি জানতেন, দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা কমছে। তিনি তাই হিন্দুত্বের তাস খেলতে চাইছিলেন হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে। এ জন্য আরএসএস- জনসংঘের থেকে বড় হিন্দুত্বের মুখ হয়ে ওঠার চেষ্টায় তিনি জনসমক্ষে তাদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখতেন। অন্য দিকে, জরুরি অবস্থার শেষ দিকে আরএসএস বোঝে, ইন্দিরাজি যেভাবে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন, তাঁর পাশে আপাতত থাকা চলে না। তারা তখন পুঁজিপতিদের টাকায় জনতা পার্টি খাড়া করার কাজে হাত লাগায়। উল্লেখ্য যে, বামপন্থী দল সিপিএম-সিপিআই জয়প্রকাশ নারায়ণের আন্দোলনে না থাকলেও আরএসএস-জনসংঘকে নিয়ে গড়া জনতা পার্টির সাথে একত্রে ভোটে ইন্দিরা গান্ধী বিরোধী জোটে শামিল হয়। ১৯৭৭-এ লোকসভা ভোটে জনতা পার্টি কংগ্রেসকে হারিয়ে সরকারে বসে।

আবার ১৯৮০-তে জনতা পার্টির সরকার ভেঙে গেলে লোকসভা নির্বাচনে ইন্দিরাজির নেতৃত্বে কংগ্রেস (ই) বিপুল ভোটে জয়ী হয়। সাংবাদিক এবং লেখিকা নীরজা চৌধুরী তাঁর 'হাউ প্রাইম মিনিস্টারস ডিসাইড' বইতে ইন্দিরা গান্ধীর অতি বিশ্বাসভাজন অনিল বালির স্মৃতিচারণা তুলে ধরে দেখিয়েছেন, ইন্দিরাজি ঘনিষ্ঠ মহলে বারবার বলতেন, আরএসএস পাশে না থাকলে ১৯৮০-তে তিনি লোকসভায় ৩৫৩ আসনে কোনওমতেই জিততে পারতেন না। জরুরি অবস্থার আগে থেকেই ইন্দিরা গান্ধী বলতে শুরু করেছিলেন, এতদিন আমরা সংখ্যালঘুদের বাঁচিয়েছি, কিন্তু তারা আমাকে ভোট দেয়নি। এবার আমি সংখ্যাগুরুদের দেখব। অনিল বালি বলছেন, বালাসাহেব দেওরস মন্তব্য করেছিলেন, 'ইন্দিরা গান্ধী বহুৎ হিন্দু হ্যায়'। ওই সময় আরএসএস মনে করেছিল ইন্দিরা গান্ধীর হাতেই তাদের ভবিষ্যৎ বেশি সুরক্ষিত। সে জন্য ১৯৮০-র নির্বাচনে তারা ইন্দিরা গান্ধীকেই জেতাতে চেয়েছিল। (এনডি টিভি, ১.০৮.২০২৩)

আরএসএস-এর প্রচারিত 'রাষ্ট্রবাদিতা'-র মূল কথা হল, শক্তিশালী রাষ্ট্র জনগণকে দমিয়ে রেখে দেশ চালাবে। শক্তিশালী দেশ বলতে তারা বোঝে সামরিক শক্তিতে বলীয়ান দেশ। যেখানে দুর্বলকে পায়ের তলায় রাখবে সবল অংশ। জনগণের ইচ্ছা নয়, প্রাধান্য পাবে শাসকদের ইচ্ছাই। তাদের গুরু গোলওয়ালকর কল্পিত হিন্দু রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু অংশের মানুষের জন্য কোনও নাগরিক অধিকারও থাকবে না। নিম্নবর্ণের মানুষ থাকবে উচ্চবর্ণের পায়ের তলায়। এটা ফ্যাসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির একটা রূপ। ১৯৩৪-এ আরএসএস নেতা মুঞ্জে, হেডগেওয়ার ইত্যাদি নেতারা ফ্যাসিবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত সশস্ত্র বাহিনী গড়ার প্রস্তাব রেখেছিলেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চরম সংকটের দিনে পুঁজির শাসনকে শক্তপোক্ত রাখতে শাসক শ্রেণি ফ্যাসিবাদের জন্ম দিয়েছে। তারা জনগণকে বোঝায়, সমস্যা সমাধানের জন্য চাই প্রশাসনিক দৃঢ়তা—এই ধুয়ো তুলে একে একে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি কেড়ে নেয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের ঠাটবাট বজায় রেখেই তার সমস্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও প্রক্রিয়াকে শেষ করে দেয়। জনগণকে কোনও এক 'মহা শক্তিশালী' শাসকের অনুগামীতে পরিণত করার চেষ্টা করে। আজকের যুগে যারাই পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের সেবা করবে তারাই ফ্যাসিবাদের ধারক বাহক হতে বাধ্য। সে জন্য আজ সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রে ফ্যাসিবাদ সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতির ধারক বাহক হিসাবে আরএসএস যেমন পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে চলেছে, আবার স্বাধীন ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারের মধ্যে তারা বন্ধু খুঁজে পেয়েছিল। আরএসএসের রাজনৈতিক শাখা হিসাবে বিজেপি আজ সেই ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী রাস্তাই নিয়েছে। মনে রাখা দরকার, ফ্যাসিবাদ কোনও বিশেষ দল আনে না, ফ্যাসিবাদ আনে পুঁজিপতি শ্রেণি। তারা কোন দলকে সামনে রেখে কোন রূপে তা কায়েম করবে তা নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।

কংগ্রেস এবং বিজেপি উভয়েই ভারতের পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী মূল দুটি দল। তাদের যতটুকু বিরোধিতা তা ক্ষমতার মসনদের ভাগ নিয়ে। বিজেপি এখন জরুরি অবস্থার পঞ্চাশ বছরে কংগ্রেস বিরোধী স্লোগান তুলছে ভোটের বাজার গরম করার লক্ষ্যে। কিন্তু জরুরি অবস্থার মতো স্বৈরাচারী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে গেলে কোনও অজুহাতেই কংগ্রেস-বিজেপির মতো পুঁজিবাদের সেবক কোনও একটি দলকে অপরটির বিকল্প হিসাবে তুলে ধারা যায় না। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলিকে সামনে রেখে একমাত্র সঠিক রাস্তায় বাম-গণতান্ত্রিক গণআন্দোলনই সেই কর্তব্য সাধনে সক্ষম।

'আলোর পথে'-র চিকিৎসা শিবির

১৫ জুন 'আলোর পথে-যাদবপুর' (আর জি কর আন্দোলনের গ্রুপ)-এর পক্ষ থেকে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগণার গোবিন্দপুর বাজারে বান্ধব সমিতি ক্লাব প্রাঙ্গণে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের সহযোগিতায় শতাধিক গরিব মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। ক্যাম্পকে সফল করার জন্য প্রায় ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবক অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছেন, অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এই দিনও সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ডাক্তার দেখানোর পর রোগীদের প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়। ক্লাব কর্তারা এলাকার গরিব মানুষের স্বার্থে প্রতি মাসে একটা করে ক্যাম্প করার জন্য অনুরোধ করেন।

কংক্রিটের মজবুত ব্রিজ নির্মাণের দাবি

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকের টোপা ড্রেনেজ খালের উপর গোবিন্দচকের কাঠের ব্রিজ ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। আপাতত স্থানীয় অধিবাসীরা ব্রিজে বাঁশ দিয়ে ঘিরে যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছে। কৃষক সংগ্রাম পরিষদের দাবি, অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে ওই কাঠের ব্রিজটি পুনর্নির্মাণ করে যাতায়াতের বন্দোবস্তের পাশাপাশি দ্রুত কংক্রিটের ব্রিজ করা হোক।

ঘাটালে বিদ্যাসাগর ও ক্ষুদিরামের মূর্তি পুনঃস্থাপনের দাবি

এআইডিএসও এবং এআইডিওয়াইও-র ঘাটাল শাখার পক্ষ থেকে বিডিও-র কাছে ১২ জুন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তি জনসমক্ষে পুনঃস্থাপনের দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিডিও জানান, মূর্তিগুলো পূর্বস্থানেই আরও উঁচু করে স্থাপন করা হবে। প্রতি বছর বন্যার কারণে মূর্তিগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। তাই সেগুলি সংস্কার করে নতুন করে পূর্বের জায়গায় স্থাপন করা হবে। উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই ওই দুই মনীষীর মূর্তি বিডিও অফিসে অযত্নে পড়ে রয়েছে।

ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ ও লালফৌজের ঐতিহাসিক বিজয়ের ৮০ বছর উপলক্ষে উত্তর কলকাতার আস্থা কমিউনিটি হলে ২১ জুনের মতবিনিময় সভা। বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য অংশুমান রায়। উপস্থিত শ্রোতারাও আলোচনায় অংশ নেন।

মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণদের সংবর্ধনা

১৫ জুন এআইডিএসও-র ভবানীপুর ইউনিটের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এআইডিএসও-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলী সদস্য শ্রাবন্তী সাঁফুই ও নিবেদিতা মণ্ডল। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী সন্দীপ মিত্র।

ইরান আক্রমণ আমেরিকার

একের পাতার পর

প্যালেস্টাইনের গাজায় নারী-শিশু সহ নিরপরাধ আরব বাসিন্দাদের নিকেশ করার পৈশাচিক কর্মসূচি চালাতে চালাতেই বিনা প্ররোচনায় গত ১৩ জুন থেকে আচমকা ইরানে হামলা শুরু করে ইজরায়েল। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর অভিযোগ— ইরানের পরমাণু অস্ত্রের সামনে ইজরায়েলের অস্তিত্ব বিপন্ন। ইজরায়েল বলেছে, আণবিক অস্ত্র প্রসার রোধ চুক্তি এনপিটি-তে স্বাক্ষরকারী ইরান সেই চুক্তি লংঘন করেছে। অথচ খোদ আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আইএইএ) সেই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের ১২ জুনের রিপোর্টে ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়ার কথা নেই। আমেরিকার গোয়েন্দা অধিকর্তা তুলসী গ্যাবার্ড স্বয়ং মার্কিন কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে গত মার্চে জানিয়েছিলেন, ইরান পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছে না। যদিও সর্বসমক্ষে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ধমকের মুখে এখন সম্পূর্ণ উল্টো কথা বলছেন তিনি। তা ছাড়া ইজরায়েল নিজেই পরমাণু শক্তিধর দেশ। তার ভাণ্ডারে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে। শুধু তাই নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সার্বিক সমর্থনপুষ্ট গণহত্যাকারী এই রাষ্ট্রটি এনপিটি-তে সই করেনি এবং আইএইএ-র পরিদর্শকদের দেশের ভিতরে সে ঢুকতে পর্যন্ত দেয় না। এর আগে ২০১৫ সালে আমেরিকা, কয়েকটি পশ্চিমী দেশ, চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি সংক্রান্ত চুক্তি হয়। ২০১৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পেরই প্রথম সরকার সেই চুক্তি থেকে সরে যায়। সম্প্রতি আবার পরমাণু শক্তি নিয়ে আমেরিকা-ইরান আলোচনা শুরু হয়েছিল। বৈঠকের পরবর্তী তারিখের ঠিক দু'দিন আগে ইজরায়েল ইরানে হামলা শুরু করে দেয়।

পিছনে অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার সহ সর্বশক্তি নিয়ে আমেরিকা দাঁড়িয়ে আছে, এই ভরসায় কার্যত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসাবেই ইজরায়েল এবার ইরান আক্রমণ করে। ১৩ জুন ইরানের আণবিক কেন্দ্রগুলিতে ইজরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র আছড়ে পড়ে। বেছে বেছে হত্যা করা হয় ইরানের বেশ কয়েকজন সামরিক আধিকারিক ও পরমাণু-বিজ্ঞানীকে। যদিও গুপ্তচর লাগিয়ে ইরানের পরমাণু বিজ্ঞানীদের যেভাবে একের পর এক খুন করছে মার্কিন-ইজরায়েল জোট, তাকে যুদ্ধ না বলে জঘন্য ব্যক্তিহত্যার রাজনীতি বলাই ভাল। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আক্রমণ শুরু করে ইরান। ইজরায়েলের বহু-প্রচারিত ও প্রশংসিত 'আয়রন ডোম' এবং 'থাড'-এর প্রতিরোধ ব্যর্থ করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হানায় রাজধানী তেল আভিভ, হাইফা সহ বেশ কয়েকটি শহরের বিপুল ক্ষতি হয়। বেশ কিছু প্রাণহানি ঘটে। বাসিন্দাদের বাঙ্কারে আশ্রয় নিতে হয়। ইজরায়েলের কাছে ইরানের এই প্রত্যাঘাত অপ্রত্যাশিত ছিল। যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সামনে পড়ে ইজরায়েল আমেরিকার কাছে ইরান আক্রমণ করার আবেদন জানাতে থাকে। রাশিয়া ও চিন আমেরিকাকে এই যুদ্ধে না জড়ানোর হুঁশিয়ারি আগেই দিয়ে রেখেছে। পাশাপাশি দেশের বাইরে কোনও সংঘর্ষে আমেরিকা জড়াবে না— প্রেসিডেন্ট পদে বসার আগে দেশের মানুষের কাছে এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন ট্রাম্প। মার্কিন কংগ্রেসের বেশ কয়েকজন সদস্য যাঁরা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁরাও আমেরিকার ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষে সরাসরি যোগ দেওয়ার বিরোধিতা করেন। সব মিলিয়ে ইজরায়েলের ইরান আক্রমণকে শুরুতেই 'চমৎকার হয়েছে' বলে অভিনন্দন জানালেও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সরাসরি ইরান আক্রমণের ব্যাপারে খানিকটা দোদুল্যমান ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দ্বিধা কাটিয়ে ইরানে প্রত্যক্ষ হামলা চালাল আমেরিকা।

কেন হঠাৎ ইরানকে আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে বেছে নিল আমেরিকা ও ইজরায়েল? আসলে দীর্ঘ দিন ধরেই এর প্রস্তুতি চলছিল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতে জায়নবাদী ইজরায়েল দীর্ঘ দিন ধরেই প্যালেস্টাইনকে বিশ্বের মানচিত্র থেকে মুছে দিতে নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার লক্ষ্য, পশ্চিম এশিয়ায় একচেটিয়া সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য কায়েম করা। এই কাজে এই অঞ্চলের আর এক সাম্রাজ্যবাদী দেশ ইজরায়েল তার প্রধান স্যাঙাৎ। প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের নির্মম আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে শরিক যে 'হামাস', 'হেজবুল্লাহ'-র মতো বেশ কয়েকটি সশস্ত্র সংগ্রামী গোষ্ঠী, তাদের পিছনে লেবানন, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরানের মতো দেশগুলির সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা রয়েছে। দীর্ঘ সংঘাতের পর ইতিমধ্যে লেবাননের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে সেখানকার হেজবুল্লাহ গোষ্ঠীর নেতা নাসারাল্লাকে হত্যা করেছে ইজরায়েল। বছরের পর বছর ধরে আমেরিকা, ফ্রান্স, তুরস্কের সহযোগিতায় নানা দেশে ছড়িয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের সিরিয়ায় প্রবেশ করিয়ে, তাদের অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে সেখানকার বাসার আল আসাদ সরকারকে হঠানোর ষড়যন্ত্রও সফল করেছে মার্কিন-ইজরায়েল চক্র। এখন সেখানকার নতুন রাষ্ট্রপতি প্রাক্তন আল কায়েদা নেতা আহমেদ হুসেন আল শারা ইজরায়েলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সিরিয়া ঢুকে পড়েছে আমেরিকা-ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদী চক্রে। এই অবস্থায় একমাত্র ইরানকে কব্জা করতে পারলেই পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকা ও ইজরায়েলের সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য অনেকটাই নিষ্কণ্টক হয়।

আয়তনে পশ্চিম এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র ইরান এই অঞ্চলের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র। এর ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানগত দিকটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমানা লাগোয়া কাস্পিয়ান সাগর, পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালীর কারণে জলপথে বাণিজ্যে সুবিধার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ইরানের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। পশ্চিম এশিয়ায় একাধিপত্য কায়েমের ক্ষেত্রে এ হেন ইরান স্বাভাবিক ভাবেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইজরায়েলের পথের কাঁটা। সেই কারণেই ইরানকে আক্রমণের লক্ষ্য বানিয়েছে ইজরায়েল তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

ইরানে ইজরায়েলের হামলার পিছনে আরও একটি কারণও গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে দেশের অভ্যন্তরে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুর অবস্থান বিশেষ সুবিধাজনক নয়। ২০২৩ সাল থেকে গাজায় লাগাতার গণহত্যা চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত হামাসের হাতে পণবন্দিদের সকলকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়নি নেতানিয়াহু সরকার। ইজরায়েলের সাধারণ মানুষ গাজায় হত্যালীলার বিরুদ্ধে বার বার পথে নামছেন। সে দেশের সংসদের বেশ কয়েকজন সদস্য নেতানিয়াহু সরকারের পদত্যাগ ও অবিলম্বে নির্বাচনের দাবি তুলেছেন। এতে ঘোরতর আপত্তি নেতানিয়াহুর। আগে থেকেই নানা দুর্নীতি সহ বেশ কিছু অভিযোগে অভিযুক্ত থাকায় তিনি জানেন, ভোটে হেরে গেলে তাঁর জায়গা হতে পারে জেলখানায়। তাই যে ভাবেই হোক দেশে যুদ্ধজনিত জরুরি পরিস্থিতি তৈরি করে নির্বাচন স্থগিত রাখতে মরিয়া নেতানিয়াহু। বছরের পর বছর হামলা চালিয়েও প্যালেস্টাইন মুঠোয় না আসায় এ বার দেশের সামনে ইরানকে তাই নতুন বিপদ হিসাবে খাড়া করেছেন তিনি। তাঁর আরও লক্ষ্য, আমেরিকাকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে দেওয়া যাতে পশ্চিম এশিয়ার পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। অন্য দিকে অর্থনীতির বেহাল দশা সামাল দিতে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার অন্যতম প্রয়োজনীয় হাতিয়ার যুদ্ধ। তা ছাড়া মার্কিন যুদ্ধজোট নেটোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধ, চিন-রাশিয়ার মতো প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যবাদীদের কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থানে ক্রমাগত পৌঁছে যাওয়া রুখতে মার্কিন শাসকদের পশ্চিম এশিয়ায় কৌশলগত আধিপত্য বজায় রাখা প্রয়োজন। এ জন্য ইরানকে বাগে আনা তার জরুরি দরকার। তাই ইজরায়েলের সঙ্গে প্রথম থেকেই ইরান আক্রমণে শামিল না হলেও যুদ্ধের দশম দিনে হামলা শুরু করল আমেরিকা।

সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে ইরানের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই বর্বর আক্রমণ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘর্ষের মাত্রা আরও অনেকটা বাড়িয়ে তুলল। এই যুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়, পরিণাম হবে অত্যন্ত মারাত্মক। যুদ্ধরত দেশগুলিতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু, পঙ্গুত্ব, সম্পত্তি ধ্বংস ও গৃহহীনতার সমস্যাই শুধু নয়, জলপথে বিশ্বের বহু দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা আছে। পাশাপাশি দুনিয়া জুড়ে জ্বালানি তেলের সঙ্কট সৃষ্টি হয়ে সমস্ত পণ্যের দাম বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে, যা জনজীবনকে ভীষণভাবে বিপর্যস্ত করবে।

এই অবস্থায় আমেরিকা, ইজরায়েল ও ইরান সহ বিশ্বের প্রতিটি দেশের যুদ্ধবিরোধী শান্তিপ্রিয় মানুষকে ইরানের ওপর মার্কিন-ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদী হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হতে হবে। বিশ্ব জুড়ে সংগ্রামী শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলে রক্তলোলুপ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত করতে হবে। আশার কথা, আরব দেশগুলি ইরানে মার্কিন আক্রমণের বিরোধিতা করেছে। বিরোধিতা করেছে রাশিয়া, চিনও। এই অবস্থায় ভারতের জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা মনে রেখে ভারত সরকারের যেখানে উচিত ছিল ইরানে মার্কিন আক্রণের কড়া নিন্দা করা, তা না করে এই সরকারকে দেখ গেল ইরানকে উত্তেজনা প্রশমনের পরামর্শ দিতে! এ ঘটনা প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে লজ্জার। এর প্রতিবাদে এগিয়ে আসতে হবে ভারতীয় জনগণকে। আওয়াজ তুলতে হবে—'মার্কিন-ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদী চক্র ইরান থেকে হাত ওঠাও।'

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 46 Bengali Weekly June 27, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

ইরানে মার্কিন হামলার বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে বিক্ষোভ

বাংলাদেশে বিক্ষোভ

ইরানে মার্কিন হামলার প্রতিবাদে বাসদ (মার্ক্সবাদী)-র ডাকে ঢাকায় মিছিল ও সমাবেশ। ২২ জুন

ছবি ঃ (উপরে) দিল্লি, ডান দিকে পাটনা, বিহার (নীচে) বাঁকুড়া, ডান দিকে জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ

আনন্দধারা প্রকল্পে কর্মরত এসসি (সংঘ কোঅর্ডিনেটর) কর্মীদের স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি সহ নিয়োগপত্র, মাসের প্রথমে কর্মীর নিজস্ব অ্যাকাউন্টে সাম্মানিক ভাতা ও প্রতি বছর বাজারদর অনুযায়ী ভাতা বৃদ্ধি সহ ১০ দফা দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ এসআরএলএমএসসি কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ২০ জুন রাজভবন ও নবান্ন অভিযান হয়। রাজ্যের ১৫টি জেলা থেকে সহস্রাধিক এস সি কর্মী কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমায়েত হয়ে মিছিল করে এসপ্ল্যানেডে ডোরিনা ক্রসিং অবরোধ করেন।

পুলিশের পক্ষ থেকে রাজভবন ও নবান্নে প্রতিনিধিদল নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে অবরোধ ওঠে। বিক্ষোভকারীরা ওয়াই চ্যানেলে একটি সভা করেন। সেখানে সংগঠনের বিভিন্ন জেলা প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সহ সভাপতি নন্দ পাত্র, স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন সহ রুনা পুরকাইত, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

স্বাস্থ্যকেন্দ্র উন্নয়নের দাবিতে মগরাহাটে নাগরিক সভা

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ‘গোকরনী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র’ (বেনীপুর-যুগদীয়া হাসপাতাল) উন্নয়নের দাবিতে ‘গোকরনী-যুগদীয়া হাসপাতাল জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি’র নেতৃত্বে ২০২৩ সাল থেকে ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে। আন্দোলনের ফলে কিছু দাবি আদায় হয়েছে— ডাক্তার আসা শুরু হয়েছে, গেট বসেছে, ওষুধের জোগান বেড়েছে, রোগী প্রতীক্ষালয়, অকেজো নলকূপ সারাই, ছ’টি বেড বরাদ্দ, দু’টি শৌচাগার হয়েছে ও আয়ুর্বেদিক ইউনিটের গৃহনির্মাণের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সম্প্রতি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য টাকা বরাদ্দ হয়েছে। বাকি দাবিগুলি আদায়ের দাবিতে আন্দোলন চলছে।

১৫ জুন যুগদীয়া হাসপাতাল মোড়ে পাঁচ শতাধিক মানুষের মতবিনিময় সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন যুগদীয়া হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির সভাপতি কবীর মোল্লা। কমিটির সম্পাদক সোমনাথ নস্কর মূল প্রস্তাব পাঠ করেন।

বক্তব্য রাখেন হাসপাতাল আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এসমতারা খাতুন, বিশিষ্ট নাগরিক মুফতি জাকারিয়া সাহেব, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য ডাঃ নয়ন পাঠক, সামাজিক আন্দোলনের নেতা আসলাম আলি শেখ, মহিলা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নেত্রী নাজিরা খাতুন, সংগঠক সঞ্জয় মণ্ডল এবং মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা জ্ঞানতোষ প্রামাণিক।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের পরিণামেই নিহত কালীগঞ্জের কিশোরী

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, মালদা জেলার কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফল প্রকাশের পর বিজয় মিছিল থেকে ছোঁড়া বোমার আঘাতে ৯ বছরের এক বালিকার মৃত্যুর ঘটনা প্রমাণ করল, নির্বাচনে জনমতের প্রতিফলনের পরিবর্তে প্রশাসনের মদতে পেশিশক্তির প্রয়োগে অতীতের সীমাকে তৃণমূল সরকার বহুদূর ছাপিয়ে গিয়েছে। তৃণমূলের নেতৃত্বে রাজনীতির এই দুর্বৃত্তায়ন এমন যে, লোকসভা, বিধানসভা থেকে শুরু করে সমস্ত ভোটই এই রাজ্যে সশস্ত্র তৃণমূল দুষ্কৃতীরা নিয়ন্ত্রণ করে। কেবল রাজ্য প্রশাসন নয়, নির্বাচন কমিশনকেও এর দায়ভার নিতে হবে।

আমরা এই ঘৃণ্য রাজনীতির তীব্র নিন্দা করছি এবং সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হতে আহ্বান করছি। পাশাপাশি অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

হয়রানি, অন্যায় জরিমানার প্রতিবাদে বাইক ট্যাক্সিচালকদের থানা বিক্ষোভ

সম্প্রতি কলকাতা বিমানবন্দর চত্বরে বাইক ট্যাক্সি (অ্যাপ বেসড) ঢোকার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। ফলে এয়ারপোর্ট থানা বাইক ট্যাক্সি চালকদের ওপরে অকারণ হয়রানি, অনৈতিক জরিমানার খাঁড়া নামিয়ে আনছে। এর প্রতিবাদে কলকাতা সাবার্বান বাইক ট্যাক্সি অপারেটর্স ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১৯ জুন এয়ারপোর্ট থানায় ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়। এয়ারপোর্ট চত্বর থেকে বাইক ট্যাক্সিচালকদের একটি মিছিল থানায় যায় এবং সেখানে অবস্থান বিক্ষোভ সভা চলে। সভা থেকে সংগঠনের সভাপতি শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে ৫ জনের প্রতিনিধি দল থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জকে ডেপুটেশন দেয়। সংগঠনের সভাপতি শান্তি ঘোষ বলেন, পরিবহণ দপ্তর কর্তৃক বাইক ট্যাক্সি চালনার বৈধ অনুমতি পত্র থাকা সত্ত্বেও কীভাবে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিমানবন্দর চত্বরে বাইক চালকদের প্রবেশাধিকার বন্ধ করতে পারে? বিমান যাত্রীরা বিমান ধরবার জন্য অথবা বিমান থেকে নেমে নিজ ঠিকানায় যাওয়ার জন্য বাইক ট্যাক্সি ভাড়া করে থাকেন কোনও না কোনও অ্যাপের মাধ্যমে। কেন এবং কার স্বার্থে পুলিশ এবং এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ বাইক চালকদের যাতায়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করছে, তার কোনও সদুত্তর আইসি দিতে পারেননি। তিনি শ্রমিক আন্দোলন তীব্র করার আহ্বান জানান এবং আগামী ৯ জুলাই সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করার আহ্বান জানান।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com